প্রথম অধ্যায়

নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা তথা সমগ্র ভারতে নাটককার, পরিচালক, অভিনেতা বাদল সরকার একাই এক প্রতিষ্ঠান। পেশায় টাউন-প্ল্যানার বাদল সরকার পাঁচ-এর দশকের গোড়া থেকেই আস্তে আস্তে থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ছোট বড়ো মিলিয়ে বিভিন্ন শ্রেণির ৫০টিরও বেশি নাটক লিখেছেন। লঘু কমেডি থেকে গভীর জীবনবেদ-বিপুল বৈচিত্র্যের সম্ভারে ঋদ্ধ তাঁর নাটক। কিন্তু নাট্যকার বাদল সরকারকেও ছাপিয়ে থাকেন একজন পুরো নাট্যকর্মী বাদল সরকার। প্রসেনিয়াম মঞ্চ থেকে দর্শকের সমস্তরে নিজেকে নামিয়ে এনে, বাড়তি উপাদানগুলিকে কেটেছেঁটে বাদ দিয়ে, নাটককে তিনি করে তুলতে চেয়েছেন নমনীয়, বহনীয় ও সুলভ। তাঁর প্রবর্তিত অঙ্গন মঞ্চের নাট্যরীতি শুধু নাটক নয়— এক পরিপূর্ণ দর্শন। শহর থেকে গ্রামে সর্বত্রই সচল নির্মেদ থিয়েটার নিয়ে বাদল সরকার ও তাঁর দল ‘শতাব্দী’ আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের এক প্রধান পথিকৃৎ। অথচ থিয়েটারের সঙ্গে কোনো নাড়ীর যোগ তাঁর ছিল না। এমনকি চারপাশের পরিবেশ থেকেও তিনি থিয়েটার সম্বন্ধে কিছুই পাননি।‘‘— তবু সেই বেপরোয়া মানুষটি কোন মায়াবি আলোর মধ্যে যে থিয়েটারকে তাঁর ‘জীবনের ধ্রুবতারা’ হিসেবে আবিষ্কার করেছিলেন সে এক রহস্য।”[1] সত্যি রহস্য বটে। থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর পরিবার বা নিকট আত্মীয়ের কারুরই আদৌ কোনো যোগাযোগ ছিল না। তথাপি বাদল সরকারের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার পিছনে কোন্ রহস্য কাজ করেছে অর্থাৎ কোন্ কোন্ ঘটনা, অভিজ্ঞতা, কোন্ পরিসর তাঁকে নাট্যকর্মী হয়ে ওঠতে সাহায্য করেছে, তা আমরা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবো। আমরা তাঁর জীবনের সেই দিকগুলিকে উন্মোচন করতে চেষ্টা করবো যা তাঁকে নাটকের প্রতি, থিয়েটারের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল।

বাদল সরকার স্কুল-কলেজের সার্টিফিকেটে সুধীন্দ্র সরকার নামে পরিচিত। সুধীন্দ্র অর্থাৎ আশা। বাদল সরকারের বাবা মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। পরবর্তীকালে ওই কলেজেরই অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। মা সরলামোনা সরকার ছিলেন সাধারণ গৃহবধূ। তাঁর পিতা চরম দারিদ্র্যের জন্য এম.এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর পিতার আশা ছিলো ছেলে হবে সেই ইন্দ্র। সেই আশায় সুধীন্দ্র নাম রাখা হয়। কিন্তু জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর জন্ম এবং কালীতলার কাছে তাঁর ডাক্তার দাদামশাইয়ের বাড়িতে যেখানে অল্পতেই জল জমে যায়। সেই কোমর জল ভেঙে দেখতে এসে তাঁর কাকা সতীন্দ্রলাল সরকার রাগ করে নাম রাখেন বাদল। এই বাদল নামটাই তাঁর জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। আর

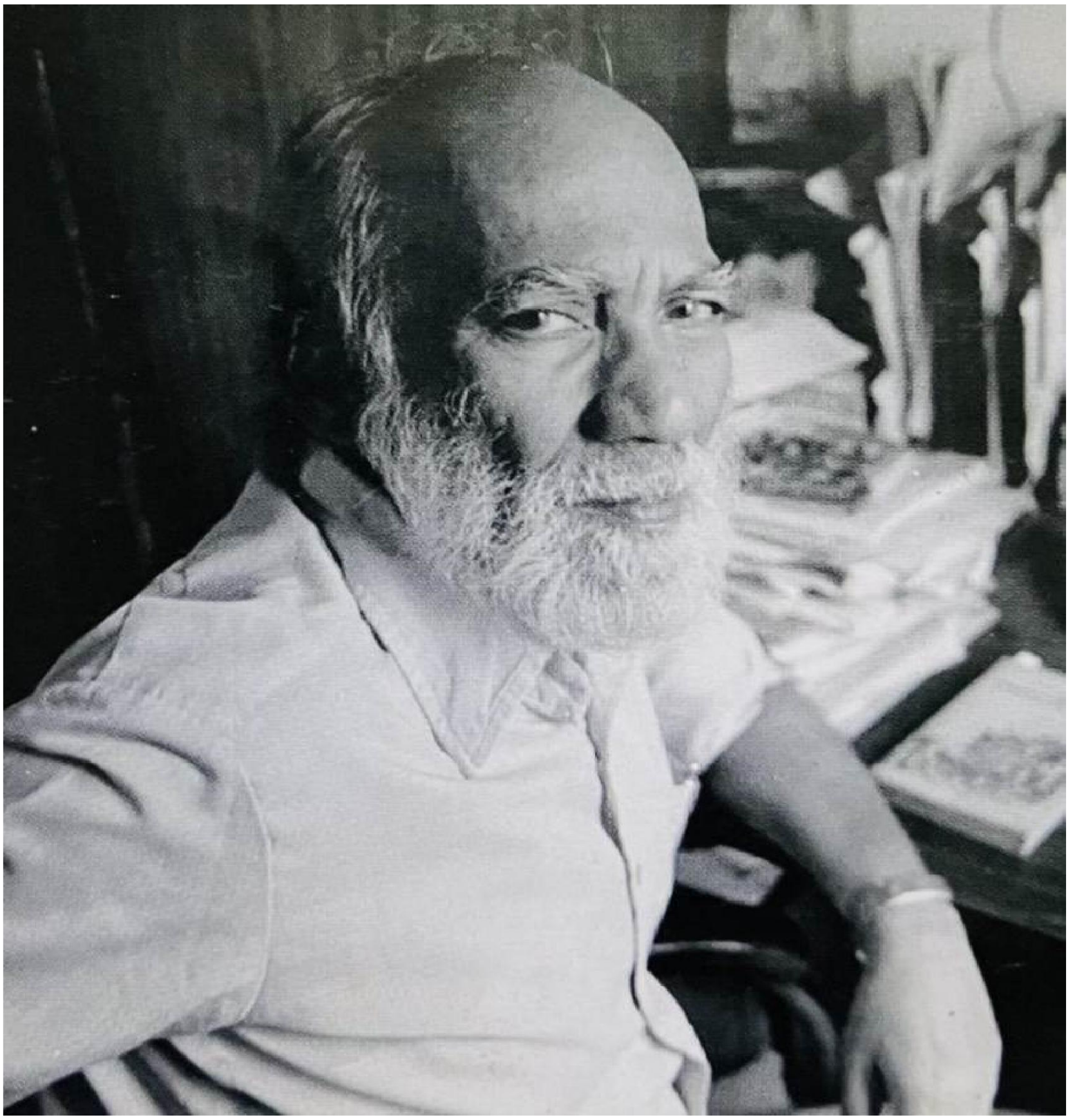

বাদল সরকার : জন্ম ১৫ জুলাই ১৯২৫। মৃত্যু: ১৩ ই মে, ২০১১।

সংগ্রহ: পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ’১৬
তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা,
সম্পাদক— সত্য ভাদুড়ি
২ সেপ্টেম্বর ২০১৪।

সুধীন্দ্র নামটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট আর চাকরির কাগজ পত্রেই থেকে গেছে। পারিবারিক সূত্রে বাদল সরকার ছিলেন খ্রিস্টান। ঠাকুরদা অশ্বিনীকুমার কিন্তু নিষ্ঠাবান হিন্দুই ছিলেন। বরিশালের বাঙাল-কায়েত। মায়ের বংশ সুবর্ণবণিক। বাবা বরিশালের বাঙাল, মা হুগলি জেলার ‘ঘটি’। শোনা যায় তাঁর ঠাকুরদা অশ্বিনীকুমারের ছোট ভাই, অর্থাৎ বাদল সরকারের বাবার কাকা বিপিন চন্দ্র সরকারই নাকি প্রথম খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ‘নিঃস্বার্থ বিশ্বাসের কারণে’। আর তারই প্রভাবে তাঁর দুই ভাইপো মহেন্দ্রলাল আর সতীন্দ্রলাল ধর্মান্তরিত হয়েছেন। বাবার মত বাদলও খ্রিস্টান

ধর্মটাকে প্রথম দিকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিল এবং এ কারণেই বছর তিন পরে যুক্তিসঙ্গতভাবে তিনি নাস্তিক হয়ে যান।

শ্রী বাদল সরকারের বংশ তালিকা

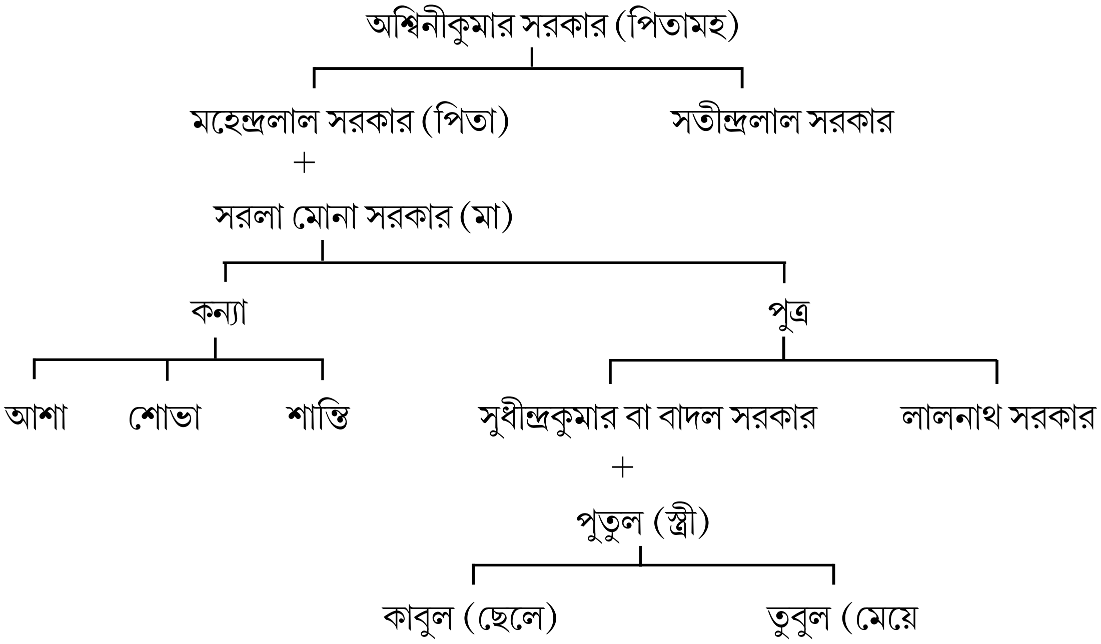
অশ্বিনীকুমার সরকার (পিতামহ)
মহেন্দ্রলাল সরকার (পিতা)
সতীন্দ্রলাল সরকার
+
সরলা মোনা সরকার (মা)
কন্যা
পুত্র
আশা
শোভা
শান্তি
সুধীন্দ্রকুমার বা বাদল সরকার
লালনাথ সরকার
+
পুতুল (স্ত্রী)
কাবুল (ছেলে)
তুবুল (মেয়ে

একেবারে আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের মতোই ছিল তাঁদের পরিবার। কোনো নাট্য ঘরানার মধ্যে তিনি মানুষ হননি। এমনকী থিয়েটার দেখবার রেওয়াজও ছিল না পিতা মহেন্দ্রলাল সরকারের বাড়িতে। এ বিষয়ে এ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘‘... নাটক নিয়ে কাজ করা বা চিন্তাভাবনা করার মতো আবহাওয়ার মধ্যে কিন্তু আমি বড় হয়ে উঠিনি। আমাদের পরিবারে নাট্যামোদী মানুষ ছিল বলে আমার জানা নেই।’’[২] তাহলে কীভাবে তিনি থিয়েটারে এলেন?

বাদল সরকারের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয় তার পঠন-পাঠনের কথা। এক্ষেত্রে পারিবারিক দিকটি তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। বাড়িতে পঠন-পাঠনের একটা পরিবেশ ছিল। শিক্ষকতা তাঁর বাবার দিক থেকে বংশগত। তাঁর ঠাকুরদা অশ্বিনীকুমার স্কুল শিক্ষক, বাবা কাকা দু’জনেই ইতিহাসের অধ্যাপক। তাঁর বাবার ঘরে বাইবেলের মতো দু-চার খানা ধর্মগ্রন্থ থাকলেও বেশিরভাগই ছিল ইতিহাসের বই। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে স্বদেশী-বিদেশী ইতিহাসের বই-ঠাসা ছিল বাড়িতে। তাঁর মাতৃকুলেও ছিল পঠন-পাঠনের অনুকূল পরিবেশ। মায়ের পরিবার ছিল সেকালের বনেদি খ্রিস্টান। মা সরলামোনা আর দিদিমা ভার্জিনিয়া মেরি নন্দী সেকালের বিখ্যাত ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র নন্দীর স্ত্রী। দিদিমাও ডাক্তার। কিন্তু ডাক্তার হলেও

ডাক্তারী করেননি। দিনরাত অনর্গল বই পড়েই কাটিয়ে দিয়েছেন সারাটা জীবন। বাংলা জানতেন না বলে বাড়িতে নানা ধরনের ইংরেজি বই থাকত। পাশাপাশি তাঁর মা-মাসিদের দৌলতে বাড়িতে বিস্তর প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী ইত্যাদির বাঁধানো সংকলনও ছিল, যা কিশোর বাদলকে দারুণভাবে টানত। বাদল সরকারের পঠন-পাঠনের দিকটি পারিবারিক এই পরিবেশ থেকে গড়ে ওঠে। বাংলা বইয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল বেশি, ইংরেজি বই পড়তে পারতেন না। ইংরেজি বই পড়ার প্রতি আগ্রহ বাদল সরকারের তৈরি করেছিল তাঁর মা। তাঁর জীবনস্মৃতিমূলক গ্রন্থ 'পুরোনো কাসুন্দি' থেকে আমরা জানতে পারি অধ্যায় পিছু এক আনা ঘুষের প্রলোভন দেখিয়ে লুইসা এম্ অ্যালকটের 'জ্যাক অ্যাণ্ড জিল' বই প্রথম পড়তে দিয়েছিলেন তাঁর মা। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজির প্রতি এভাবেই আগ্রহ তৈরি হয়। তাঁর পড়ার মধ্যে নাটকের বই ছিল সবচেয়ে প্রিয়। নাটক অনেকে পড়ে না, বাদল সরকার ছোটোবেলা থেকেই নাটকের বই পড়তে ভালো বাসতেন। তিনি জানিয়েছেন—

> ''নাটক পড়তে আমার স্কুলজীবন থেকেই ভালো লাগত; অনেকে নাটক পড়তে ভালোবাসে না, খালি দেখে। আমি বাংলা ইংরেজি নাটক যা হাতের কাছে পেয়েছি, স্কুলজীবন থেকেই পড়ে গেছি।''[৩]

নাটক পড়ার ইচ্ছেটা প্রবল, কিন্তু বাড়িতে বেশি নাটকের বই ছিল না। তাঁর মেজদির পাঠ্য অন্তর্ভূক্ত কিছু ইংরেজি নাটক যেমন— এইট মর্ডান প্লেজ নামে ইংরেজি নাটকের একটা বই থেকে 'স্লিপার্স অফ সিন্ডারেলা', বার্নার্ড শ-এর 'আর্মস্ অ্যান্ড দ্যা ম্যান' পড়েছেন। আর বাংলা দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, গিরিশচন্দ্রের কিছু নাটক; এগুলিই ছিল ছোটবেলার নাটক পড়ার সম্বল। অবশ্য স্কটিশ চার্চ কলেজে আই.এস.সি পড়বার সময় কলেজের লাইব্রেরি, রামমোহন রায় গ্রন্থাগার আর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ থেকে অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে প্রচুর নাটকের বই পড়েছেন। নিজেই জানিয়েছেন সেকথা—

> ''...বানার্ড শ প্রায় শেষ, শেক্সপীয়র শেরিডান চেষ্টা করছি, দাঁত বসছে না, মলিয়েরকে আবিষ্কার করছি, গল্স্ওয়ার্দিকে, ডি.এইচ. লরেন্সকে।''[৪]

বাল্যকালের এই যে বাংলা-ইংরেজি নানা ধরনের নাটক পাঠ—এটাই তাঁর নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার 'প্রথম বীজ'। পড়তে পড়তে নাটকের প্রতি একটা আগ্রহ তৈরি হয়। নাটক পড়ার সময় নাটকের দৃশ্যগুলির অভিনয় দেখতে পেতেন। কল্পনায় তলিয়ে যেতেন তার ঘটনাবলির মধ্যে। এইভাবে একটা ভালোলাগার জায়গা তৈরি হয়। আর সেই ভালোলাগার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটা অংশগ্রহণ। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য—

> ''আমাদের এক একটা জিনিস ভালো লাগে; ভালো লাগে বলে সেটা বেশি করে

> চর্চা করি, চর্চা করি বলে সেটা আয়ত্ত হয় এবং ভালো করে করতে পারলে উৎসাহ বাড়ে, এইভাবে আস্তে আস্তে একটা ইনভলভ্‌মেন্ট এসে যায়। এইভাবে জিনিসটা শুরু হয়।”[৫]

নাটকের প্রতি আগ্রহ থেকেই একদিন বাদল সরকার তাঁর পিতার তিনতলার ঘরটি দখল করে কোনো এক রবিবারের দিন কোনো একটা বাংলা নাটক নিয়ে একাই সব ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। এইভাবে নাটকের সঙ্গে তাঁর একটা ‘ইনভলভ্‌মেন্ট’ এসে যায়। নাটকের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা— অধিক থেকে অধিকতর নাটক পাঠ তাঁর ভূমিকে সযত্নে নির্মাণ করেছে।

ছোটো বেলায় নাটক পড়ার পাশাপাশি রেডিও নাটক শোনাও ছিল বাদলের নেশা। বাড়িতে এভাবেই পূরণ করতেন অভাবটা। যেহেতু থিয়েটার দেখার রেওয়াজ ছিল না তাই রেডিওতে নাটক শুনে নাটক দেখার সাধপূরণ করতেন। সেকালে সপ্তাহে একদিন রেডিওতে টানা তিন ঘন্টার নাটক হতো। সাধারণ পেশাদারি মঞ্চ-স্টার রঙ্‌মহল-মির্নাভার মত কিছু মঞ্চের সফল প্রযোজনাগুলোই রেডিওতে সরাসরি প্রচার হত। রেকর্ড রাখার যন্ত্র ছিল না। ফলে ভুল হলে শ্রোতা শুনতেন সরাসরি। কিছু ছিল আকাশবাণীর নিজস্ব প্রযোজনা। সেই রেডিওর কল্যাণে ছাত্রাবস্থা থেকেই নাট্যজগতের তখনকার বঙ্গীয় মহারথীদের অভিনয়, কণ্ঠস্বর তাঁর সব পরিচিত ছিল। যেমন শিশির ভাদুড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ভূমেন রায়, রবি রায় ইত্যাদি। মহিলাদের মধ্যে নিভাননী, রাণীবালা, সরযুবালা, প্রভাদেবী। এইসব অভিনেতা-অভিনেত্রী বাদল সরকারের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি জানিয়েছেন:

> ‘‘এক একটা নাটকে এক একজন অভিনেতা জম্পেশ হয়ে বসে যেতেন, সে চরিত্রে আর কাউকে ভাবাই যেতো না। যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান অহীন্দ্র চৌধুরীর একচেটে, শচীন সেনগুপ্তর সিরাজুদ্দৌল্লা বরাবর নির্মলেন্দু লাহিড়ি, কেদার রায়ের শ্রীমন্ত নরেশ মিত্র, কার্ভালো ভূমেন রায়।”[৬]

এভাবে নাটক শুনতে শুনতে নাটকের তথা থিয়েটারের প্রতি একটা ভালো লাগা তৈরি হয়। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, চক্রান্ত কিংবা স্বদেশ প্রেমের জন্য আত্মবলিদান এ সমস্ত বেশ উদ্দীপ্ত করত বালক বাদল সরকারকে।

বাদল সরকারের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে নানা জনের প্রভাব অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় তাঁর ক্লাস সিক্সের বাংলার শিক্ষক সরসীবাবুর কথা। সরসীবাবু তাঁকে লেখালেখির ক্ষেত্রে বারবার উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতে কিভাবে একটা লেখাকে উন্নত করা যায়। এ প্রসঙ্গে বাদল বলেছেন:

> ''একটা হোলো— ওরে লেখ্ লেখ্, আমরা বলি লেখাপড়া, পড়ালেখা বলি কি? আর একটা হোলো— কিছু লিখে মাসখানেক ফেলে রাখবি, তার পরে যদি পড়ে ভালো লাগে লেখাটা, তবে বুঝবি এক ফোঁটাও উন্নতি হয়নি। যদি কাঁচা মনে হয়, তবে বুঝবি একটু এগিয়েছিস।''[৭]

এই উপদেশ বাদল সরকারের নাট্যবোধ তৈরিতে গভীর প্রভাব ফেলে। একদিন সরসীবাবুর উপদেশ শিরোধার্য করে নিয়ে নাটক পাঠের পাশাপাশি এবার নাটক রচনার চেষ্টা করলেন। সপ্তম শ্রেণির ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকের পিণ্ডারী যুদ্ধকে নাটকে রূপান্তরিত করলেন। দুর্দান্ত ডাকাত পিণ্ডারীরা, তারা ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হন। যারা তখন ভারতের মানচিত্রে টেনে লাল রং লাগাচ্ছে যা দেখে শিখ বীর রঞ্জিৎ সিংহ নিশ্বাস ফেলে বলেছিল 'সব লাল হো যায়গা'[৮]। পিণ্ডারীদের তিন সর্দারের একজন লড়াইয়ে মরলো, একজন লাপাতা হয়ে গেলো, তৃতীয়জন আত্মহত্যা করলো— ব্যস্ এর চেয়ে নাটকীয় উপাদান-সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে আর কি হতে পারে। এই ঘটনা নিয়েই জীবনের প্রথম নাটকটি লিখে ফেললেন বাদল। নাম দিলেন 'পিণ্ডারীর যুদ্ধ'। এ নাটক প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন—

> ''গোটা পাঁচ ছয় তিন-চার পাতার দৃশ্য। সব বিভিন্ন পটভূমিকায় এবং কী কারণে জানি না— ঐ স্বল্পদৈর্ঘ্য দৃশ্যেরই কয়েকটায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার ছিল, অর্থাৎ প্রযোজনা অসম্ভব। সে ব্যাপারটাই তো সম্পূর্ণ অজানা তখন। তবু এটাই আমার প্রথম নাট্যরচনা, সৌভাগ্যক্রমে নিঃশেষে অবলুপ্ত।''[৯]

নাটকের হাতেখড়ি এই প্রথম। নাট্যবীজের পরিচয় ঐ হারিয়ে যাওয়া নাটক। কোনো নাট্যঘরানায় তিনি মানুষ না হলেও বালক বয়সে নাটক রচনার এই প্রচেষ্টা বেশ বিস্ময়কর। নিতান্ত ভালোলাগা থেকে চর্চা করার বিষয়টি এভাবেই যুক্ত হয়েছে।

বাদল সরকারের নাট্যকর্মকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল তাঁর মেজদিদি শোভা সরকার। বাদল সরকারের নাটকের সাথী বরাবরই তার মেজদি। মেজদির সঙ্গে সপ্তাহে একদিন রেডিও নাটক শুনতেন বাদল। হয়তো নিয়ম করে নাটক শুনতে শুনতে কখন যেন নিজের অজান্তেই নাটকের চোরকুঠুরিতে ঢুকে পড়েছিলেন। তাই বাদল যখন তাঁর পাঠ্যবই থেকে 'স্লিপার্স অফ সিন্ডারেলা' নিয়ে একখানা নাটক লিখে ফেললেন প্রবেশিকা পরীক্ষার ছুটিতে। তা পড়ে তাঁর মেজদি ভীষণ আপ্লুত। প্রবল উৎসাহে নিজেই বাড়ির ছোটোদের নিয়ে সে নাটক মঞ্চস্থ করলেন। সেই নাটকের পরিচালক ও অভিনেতা বাদল সরকার। সেই সদ্যোজাত নাটকের প্রয়োগ এবং তার সাফল্য, অর্থাৎ বড়োদের প্রশংসা বিশেষত মেজদির উৎসাহ বাদলের ভিতরে নাটককার এবং নাট্যকার হয়ে

ওঠার বুনট তৈরিতে সহায়ক হয়েছিল। এখানেই প্রথম তিনি একই সঙ্গে নাট্যকার-নির্দেশক-নায়ক। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> ‘‘অভিনয় জগতে আমার প্রবেশ অতএব একাধারে নাট্যকার-পরিচালক-নায়ক হয়ে, কজনের ভাগ্যে জোটে এমন?’’[১০]

বাদল সরকারের মেজদির সহপাঠিনী সুকুমারী দেবীও তাঁকে নানাভাবে নাটক রচনায় উৎসাহিত করেছেন। মায়ের পর সুকুমারী দেবীই তাঁকে ইংরেজি পড়তে অনুপ্রাণিত করেছেন। সুকুমারী দেবীর দৌলতে মার্কিন নাট্যকার ইউজিন গ্ল্যাডস্টোন ওনিল এর নাম প্রথম জানতে পারেন বাদল। পাশাপাশি অ্যালডাস লিওনার্ড হাক্সলি, রোম্যাঁ রোলাঁ, জেমস্ জয়েসের রচনা সুকুমারী দেবীই তাঁকে পড়িয়েছেন। শুধু পড়া নয় বাদলের লেখা-লেখির ব্যাপারেও সুকুমারী দেবীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বি.ই কলেজে পড়ার সময় বাদল সরকার গলস্‌ওর্য়াদির ‘দ্য রুফ্’ (The Roof) নাটকের কাঠামোর আদলে ‘আগুন’ নাটক লেখেন। এই নাটক লিখে বাদল সরকার বেশ উৎফুল্ল ছিলেন। কারণ অনুবাদ হলেও অনুকরণ করেন নি। বিভিন্ন ঘরের চরিত্র আর তাদের কাহিনিগুলো নাট্যকারের নিজস্ব। তাঁর মনে হয়েছে তিনি প্রায় মৌলিক একটা নাটক লিখতে পেরেছেন। প্রবল উৎসাহে নাটকটি সুকুমারী দেবীকে দেখতে দিয়েছেন এই আশায় যে কিছু প্রশংসা পাবেন। কিন্তু হায়! বদলে জোটে অঢেল লাঞ্ছনা। তাঁর লিখিত নাটক পড়ে সুকুমারী দেবীব প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে বাদল সরকার লিখেছেন—

> ‘‘ফালা ফালা করে চিড়ে সমালোচনা করেছেন। কী খুঁটিয়ে যে পড়েছেন মহিলা, একটা দোষ নজর এড়ায় নি। আর এতো দোষও ছিল! সবচেয়ে বড়ো দোষ—ওটা নাটকই হয়নি, যা হয়েছে সেটা বদ্‌হজম।’’[১১]

তবে সেদিনের এই গঠনমূলক সমালোচনা কিন্তু বাদল সরকারের নাট্যপ্রতিভার উন্মেষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। বাদল সরকার জানিয়েছেন—

> ‘‘সেদিন আমার যাই মনে হোক না কেন, আমার বহু রোগ ঐ এক দিনে সুকুমারীদি ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। নাটকটা অবহেলায় হারিয়ে গেছে, তার পরে বছর বারো নাটক লেখার চেষ্টা কখনো করি নি। অবশেষে যখন লিখেছি, একটা সমালোচকের কড়া চোখ খোলা থেকেছে ভিতরে, পাহারা রেখেছে— স্বাধীন জেনানা যেন আর না বেরোয়। সেদিনকার সমালোচনার ধাক্কা না খেলে ও চোখ তৈরি হতে অনেক দেরি হতো। সুকুমারীদির প্রত্যেকটি যুক্তি আমি মানতে বাধ্য হয়েছিলাম।’’[১২]

বাদল সরকার পরবর্তী জীবনে দেশী-বিদেশী অনেকের নাটক, গল্প, উপন্যাস, সিনেমা থেকে নাট্যরূপ দিয়েছেন, অনুবাদ করেছেন কিন্তু সুকুমারী দেবীর ঐ সমালোচনার কারণেই হয়তো আর

স্বাধীন-‘জেনানার’ প্রকাশ দেখা যায়নি।

বাদল সরকারের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল তমলুক পর্ব। বাদলের সরকার কলেজ জীবনের প্রথমবর্ষে এলো জীবনের এক বিরাট বিপর্যয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন শুরু হয়েছে। আগ্রাসী জাপানি বাহিনীর আক্রমণের ভয়ে সারা কলকাতা ত্রস্ত। কলকাতাবাসী যথাসম্ভব সম্বল নিয়ে বা অনেক কিছু ফেলে পলায়ন শুরু করে। হাতিবাগান, খিদিরপুরে বোমা পড়তেই তাঁর বাবা বাড়িভাড়া করে পরিবারের বাকিদের সঙ্গে বাদলকে তমলুক পাঠিয়ে দেন। অতীতের তাম্রলিপ্ত বর্তমানের তমলুক সংস্কৃতি সম্পন্ন জনপদ। তমলুক এসে দেখলেন থিয়েটারের জমজমাট ব্যাপার। তাই দেখে ভিতরে জমে থাকা থিয়েটারের নেশা তাঁকে প্রবলভাবে উত্তেজিত করে। প্রতিবেশী বন্ধু অরুণ, তপন এবং আরো কয়েকজন মিলে বাদলের উৎসাহে শুরু হলো শরদিন্দুর ‘ডিটেকটিভ’ নাটকের মহড়া। এখানে উল্লেখ্য ছোটবেলায় বাদলের প্রিয় কয়েকটি নাটকের মধ্যে শরদিন্দুর ‘বন্ধু’, ‘লাল পাঞ্জা’ আর ‘ডিটেকটিভ’ ছিল অন্যতম। তাই এবার যখন অভিনয় করার সুযোগ এলো, খুব স্বাভাবিক ভাবেই ‘ডিটেকটিভ’ নাটকটিই অভিনয়ের জন্য মনোনীত করলেন। বাদলের পছন্দ তোৎলা সমরেশের ভূমিকায় অভিনয় করা। এ বাসনা তাঁর স্কুল জীবন থেকেই সুপ্ত ছিল। কলকাতায় তাঁর পিতার তে-তলার ঘরে বসে বাদল বহুবার পড়েছেন ঐ নাটক এবং জোর করে তোৎলা সমরেশের সংলাপ তোৎলাতে তোৎলাতে পড়তেন। নাটকের মহড়া দিলেন ঠিকই কিন্তু বড়োদের এই নাটক পছন্দ হওয়ায় তারাই নাটকটার দখল নিয়ে নেয়। তাই শেষ পর্যন্ত সমরেশ চরিত্রটা বাদলের করা হয়ে ওঠেনি। বাদলকে নায়কের দিদি সুরমার চরিত্রে অভিনয় করতে হয়। থিয়েটারের নেশা তখন এমন চেপে বসেছে যে মন খারাপ করা সত্ত্বেও নারী চরিত্রে অভিনয় করতে তিনি রাজি হয়ে যান। বাদল সরকার সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন—

> ‘‘ফিমেল পার্ট? কিন্তু নেশা এমন প্রবল যে তাতেই রাজি হলাম। নায়ক অনন্ত বড়োদের একজন, ...।’’[১৩]

এতদিন নাটক ছিল ভালো লাগার বিষয়। তমলুকে এসে সেটাই এবার নেশার দিকে এগোলো। অর্থাৎ বাদল সরকার ক্রমশ এগিয়ে চলেছেন থিয়েটারের দিকে। স্ত্রী চরিত্রে অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা বাদলকে ভবিষ্যতের একজন দক্ষ অভিনেতা হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ‘স্লিপার্স অফ সিণ্ডারেলা’র পর প্রকাশ্য মঞ্চে বাদলের এটাই প্রথম অভিনয়। শুধু অভিনয় নয়, তমলুকেই প্রথম পেশাদার থিয়েটারের সঙ্গে বাদলের পরিচয়। এই তমলুক পর্ব তাঁর মনে কী গভীর প্রভাব ফেলেছিল সেকথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

> ‘‘হাজার তিনেক দর্শকের জমায়েৎ। নাটকের কোনো লাইন কাটা হয় না, সখীনৃত্য বাউলের গান—সব থাকে, রাত কাবার করতে হবে তো ? কেদার রায় দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে ঢুলে পড়েছি, কিন্তু যেটুকু দেখেছি অপূর্ব লেগেছে। অতোগুলো বাঘা বাঘা অভিনেতা একসঙ্গে কখনো দেখি নি। অবশ্য কোনো পেশাদার থিয়েটারই দেখি নি তখন পর্যন্ত ... ।’’[১৪]

তমলুকের এইসব অভিজ্ঞতা তাঁর নাট্যবোধ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তমলুকেই প্রথম পেশাদার থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর চাক্ষুস পরিচয়, সেই সঙ্গে তাঁর সৌভাগ্য হলো প্রথম শ্রেণির অভিনেতাদের চাক্ষুস অভিনয় দেখার অভিজ্ঞতা। যেখানে পঠন-পাঠনই ছিল এতদিন একমাত্র সম্বল, এবার যুক্ত হলো সরাসরি নাটকের নাট্যায়ন দেখার নতুন অভিজ্ঞতা। নাট্যমোহিত বাদল সরকারের ভবিষ্যতের ভিত এই ভাবেই নির্মিত হয়। তমলুক থেকে ফিরে এসে বাদল আবার মেতে উঠলেন থিয়েটার নিয়ে। তবে এবারে অনেক বেশি পরিণত বাদল সরকারকে আমরা দেখতে পেলাম। নট-নাট্যকার- পরিচালক রূপে আবার আবির্ভাব বাদল সরকারের। এবার তিনি নায়ক। অভিনয় বাড়ির বৈঠকখানায়। শিবরাম চক্রবর্তীর একটি গল্পকে নাট্যরূপ দিলেন। এখানে বাদল একাই নির্দেশনার ভার নিয়ে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। এই নাটকটিরও অস্তিত্ব নেই। এ নাটকের বৈশিষ্ট্য এই যে নাটকের প্রয়োজনে চাকর ভজহরি চরিত্রটি তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়া বন্ধু-বান্ধব জাতীয় কিছু চরিত্রও নাটকে সংযোজন করেছিলেন। নাটক অভিনয় করতে গিয়ে হয়েছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। মৌলিক নাট্যরচনার ক্ষেত্রে বাদল সরকারের প্রথম পদক্ষেপ এভাবেই— অন্যের সৃষ্টির মধ্যে নিজস্ব নির্মাণে।

বাল্যকালে বাদল সরকার রেডিও নাটক শুনেই থিয়েটারের দেখার অভাব পূরণ করতেন। কিন্তু থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতা যে একেবারেই হয়নি এমনটা নয়। বিভিন্ন সময় ছোটোখাটো থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতাও বাদলের হয়েছিল। সেইসব থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতাও তাঁর হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। ক্লাস টেনে পড়ার সময় ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত সিরাজুদ্দৌল্লা নাটকের অভিনয় দেখেছেন। স্কটিশ চার্চ কলেজ হস্টেলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের পরিচালিত নাটক দেখেছেন। সেখানে দেখেছেন পরশুরামের গল্প অবলম্বনে নাটক ‘বিরিঞ্চিবাবা’, ‘লম্বকর্ণ’, ‘চিকিৎসাবিভ্রাট’ ও ‘রাতারাতি’। তারপর শিবপুর বি.ই. কলেজে পড়ার সময় দীর্ঘ চার বছর সেখানে থিয়েটার দেখেছেন। কয়েকজন নাট্যোৎসাহী বন্ধু মিলে চণ্ডীচরণ সেনের ‘মহারাজ নন্দকুমার’ গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত ‘মহারাজ নন্দকুমার’ নামে স্বদেশমূলক একটি নাটকে অভিনয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও বাদল দমে গিয়েছেন বড়োদের কাছ থেকে ফিমেল পার্টের প্রস্তাব পেয়ে। এরপর আর

অভিনয় করার কথা ভাবেন নি শুধু থিয়েটার দেখে গেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

> ‘‘...চারটে বছর কেটেছে এখানে, খুব উৎসাহ নিয়ে থিয়েটার দেখেছি কিন্তু এগোই নি কখনো।’’[১৫]

কিন্তু এইসব ছোটোখাটো থিয়েটার দেখেই থিয়েটার করার প্রবল আগ্রহ তৈরি হয় বাদল সরকারের মনে। তাঁর নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এইসব অভিজ্ঞতাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বাদল সরকারের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাঁর রাজনৈতিক জীবন। রাজনীতিতে আসা প্রসঙ্গে বাদল সরকার বলেছেন —

> ‘‘ঠিক যেমন আমি নাস্তিক হয়েছি নিজের যুক্তি আর বোধবুদ্ধির ঠেলায়, কোনো গুরুর প্রভাবে নয়, তেমনি রাজনীতিতেও কোনো দাদা বা গুরু আমাকে আনে নি। চারপাশের যে চাপ বোধ করতাম, সে বোধটা ছিল অন্ধ, অর্থাৎ কোনো প্রতিকার নেই, মেনে নিতেই হবে। লিওনটিয়েভের বইয়ে সমাজ বিবর্তনের আলোচনা আমাকে প্রথম সচেতন করলো— এ চাপ আমার ব্যক্তিগত সমস্যা নয় শুধু, এটা বর্তমান সমাজের ব্যাপার। সমাজটা আগেও বদলেছে, আবার বদলানো যায় এবং বদলাতেই হবে— সেটাই একমাত্র কাজ।’’[১৬]

শিবপুর বি.ই কলেজে পড়ার সময় থেকেই বাদল সরকার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। সে সময়ের রাজনৈতিক উত্তাপ ভালো ভাবেই তিনি অনুভব করেছেন। তাঁর কলেজ জীবনে ফার্স্ট ইয়ার শেষ হতে না হতেই ১৯৪২-এ গান্ধীজীর ‘কুইট ইণ্ডিয়া’ ধ্বনি ভারতে চরম উন্মাদনা তৈরি করে। কলকাতায় তখন চরম অরাজকতা। আবার ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাপান অতর্কিতে পার্ল হারবারের মার্কিন ঘাঁটি আক্রমণ করার পর আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়। হিটলারের নাৎসি বাহিনী যখন সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করলো, তখন কমিউনিস্ট পার্টি জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করলো। বহু বছরের নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলো, ফলে কমিউনিস্ট পার্টি মাটির নীচ থেকে বাইরে বেরোলো। আবার এই নীতি গ্রহণের ফলে অনেকের চোখে অপ্রিয় হয়ে পড়লো।

এদিকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নিপীড়নের বীভৎসতা, শাসক গোষ্ঠীর খাদ্য সংগ্রহের নীতি, মজুতদার ও কালোবাজারিদের সীমাহীন অর্থতৃষ্ণা, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদির প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ ১৯৪৩ সালের দেশব্যাপী মন্বন্তর। গ্রাম থেকে দলে দলে উপবাসী মানুষের ভীড়ে কলকাতা তখন মৃত্যু নগরী; তাদের কেউ লঙ্গর খানায় খিচুড়ি খেয়ে বেঁচেছে, কেউ ফুটপাতে না খেয়ে মরছে। অন্যদিকে কলকাতায় ব্ল্যাক আউট মধ্যরাত্রে সাইরেন, জাপানি বোমার সর্বগ্রাসী ত্রাসে কলকাতা ছেড়ে দলে দলে পলায়ন। এইসব ভয়ংকর অভিঘাত সমাজ সচেতন বাদল সরকারকে রাজনীতি থেকে দূরে

সরিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি শুধু পার্টিতে যোগ দেওয়াই নয়, দলের সংগঠনের প্রচারে দিনের পর দিন বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেরিয়েছেন সভা-মিটিং-মিছিল-ধর্মঘট করেছেন। একটা সময় ট্রেড ইউনিয়নে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু নানা কারণে দলের সঙ্গে বাদল সরকারের দূরত্ব তৈরি হয়। দু' বছরের রাজনৈতিক সম্পর্ক শেষ হয় ১৯৪৯-এ, এবং পাকাপাকি ভাবে ১৯৫০।

আসলে বাদল সরকারের রাজনীতিতে আসার মূলে রয়েছে তাঁর জীবনাদর্শগত প্রবণতা। একজন প্রকৃত শিল্পীর চেতনাই তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর শৈল্পিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক চেতনা। সেই চেতনাই তাঁকে এক সুস্থ সমাজের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। মানুষ তাঁকে ভাবিয়েছে তিনি মানুষের জন্য ভেবেছেন। মহামারী ও দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের জন্য চাঁদা তুলেছেন। লঙ্গর খানায় খিচুড়ি পরিবেশন করেছেন। শিল্পীর শুভবোধ তাঁকে এদিকে ঠেলে দিয়েছে। তাই এই পর্বটিও তাঁর নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কাছে বাঁচার অর্থ প্রকৃত অর্থে বাঁচা— বিপরীতে মরা। পরবর্তীকালে তাঁর নাটকের ভেতর সে বক্তব্য দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। যে মানুষ একসময় মানুষে মানুষে ভালোবাসার বন্ধনে বিশ্বাসী হয়েই রাজনীতির জগতে গিয়েছিলেন, যিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের সহাবস্থানের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই চিন্তাদর্শনই তাঁকে ভবিষ্যতে অন্য ধরনের এক নাট্যদর্শন নির্মাণে উৎসাহিত করেছে। তিনি ভালো ভাবেই উপলব্ধি করেছেন রাজনীতির পাশাপাশি থিয়েটারও মানুষের সংযুক্তির একটা প্ল্যাটফর্ম। তিনি অনুভব করেছেন যে এই মাধ্যমেও মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান ঘোচানো যায়। ভবিষ্যতে তিনি যে এক নতুন নাট্যদর্শন নির্মাণ করেছেন সেটার মূলে তাঁর এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও তাঁকে অনেকাংশে ভাবিয়েছে। রাজনৈতিক জীবনের পাঠ থেকেই তিনি থিয়েটারের রসদ পেয়েছেন। এ বিষয়ে বাদল সরকার একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন:

> ‘‘— আমি বুঝতে পারলাম এইবার আমি গ্রামের শ্রমজীবী মানুষের কাছে চলে যেতে পারি, যা আগে করতে পারতাম না। প্রায় বিনে পয়সায়, শুধু অভিনয়ের পরে ওদের দান সংগ্রহ করে, নাটক দেখাতে পারি আমরা।... তখন একটা ফিলোজফি মাথায় এল, খালি চিত্তবিনোদনের জন্য নাটক নয়, চিত্তবিনোদন নিশ্চয়ই করব, কিন্তু তার সঙ্গেই থাকবে সমাজচেতনা, রাজনীতি। এইটাই নাটকের পর নাটকে প্রকাশ করলাম। এখানেই বৃত্তটা সম্পূর্ণ হল।’’[১৭]

রাজনৈতিক নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সদ্য বি.ই. পাশ করা বাদল চাকরি সূত্রে চলে যান নাগপুরের একটি অজগ্রাম খাপড়খেড়া। জীবনে প্রথম চাকরি এখানেই। অবসর সময়ে শেক্সপীয়রের ‘জুলিয়াস সিজার’, কিং লিয়ার', ‘ক্লিওপেট্রা’ পড়ে নাটকের সঙ্গে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রেখেছেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেখান থেকে ফিরে এসে বাদল সরকার ক্যালকাটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সহকারী অধ্যাপক

পদে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে ধর্মীয় সংস্কার অগ্রাহ্য করে বাড়ির অমতেই ১৯৪৯ সালে বিয়ে করেন। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই আর থাকল না। আবার চাকরি বদল করলেন। যোগ দিলেন যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে লেকচারার পদে। এরই মাঝে শিবপুর বি.ই. কলেজে আবার ছাত্র হয়ে ভর্তি হলেন পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন টাউন অ্যাণ্ড রিজিওন্যাল প্ল্যানিং কোর্সে। তখন দিনের বেলায় যাদবপুরে ছাত্র পড়ানো আর সন্ধ্যেবেলায় শিবপুরে ছাত্র হয়ে পড়তে বসা। সাংসারিক নানা কারণেও তিনি কিছুটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এতকিছুর মধ্যেও থিয়েটারের প্রতি তাঁর আগ্রহ বিন্দুমাত্র কমেনি। শ্রী অনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত ‘কেদার রায়’ নাটকে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এক সমাবর্তন উৎসবে লেকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অভিনয় করেন। এ প্রসঙ্গে বাদল লিখেছেন—

> ‘‘এতোদিনের ফাঁকে ধরে নিয়েছিলাম ও পাট শেষ, কিন্তু দেখা গেলো ও বীজ মরবার নয়।’’[১৮]

থিয়েটারের নেশা এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে এন্টালির অধ্যাপক আবাসন এবং পাড়ার কয়েকজন নাট্যোৎসাহী মিলে ‘Entally Novice Artiste’s Cultural Association’ সংক্ষেপে ‘ENACA’ নামে একটি থিয়েটারের দলই গঠন করে ফেললেন। মূলত: আবাসনের গৌরবাবু বলে এক নাট্যোৎসাহী আর আবাসনের অরুণ বাবু, প্রতীপবাবু এবং বাদল সরকার মিলে ‘এনাকা’-র প্রতিষ্ঠা করলেন। এ প্রসঙ্গে বাদল জানিয়েছেন —

> ‘‘তখন থাকতাম এন্টালিতে অর্থাৎ কলকাতা জেলায়, চাকরি করতে যেতাম যাদবপুরে, তখনও যা চব্বিশ পরগনা আর সন্ধেবেলা বি.ই. কলেজে, সপ্তাহে তিনদিন, সেটা হাওড়া জেলা — দিনে তিনটে জেলা পরিক্রমা করে আমার হাতে সময় বা শরীরে দম্ একেবারেই বেশি থাকত না। তা সত্ত্বেও পাড়াতে তখন একটা থিয়েটারের দল তৈরি হচ্ছিল, সেই দলে ঢুকে পড়েছিলাম।’’[১৯]

এই প্রথম বাদল সরকার কোনো নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। এনাকার বেশ কিছু নাট্যপ্রযোজনা খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। তাদের প্রথম প্রচেষ্টা সুবোধ বসুর ‘অতিথি’ নাটক। কলেজ স্ট্রিটের ওয়াই-এম-সি-র পেছন দিকের একটি ছোট্ট হল ঘর ভাড়া নিয়েই সেখানে নাটকটি অভিনীত হয়। বাদল সরকার একটি ছোট্টপার্ট (মনুবাবু) করেন। কারণ যাদবপুর শিবপুর ঘুরে এসে সময় পেতেন না। ‘এনাকা’ নাট্যসংস্থা অনেকটা সৌখিন নাট্যসংস্থার মতই পরিচালিত হত। বন্ধু বান্ধবদের কাছে চাঁদা তুলে, নিজেরা চাঁদা দিয়ে এবং নিমন্ত্রণ করে দর্শক আমদানি করে অভিনয়ের যাবতীয় খরচ চালানো হতো। ‘এনাকা’র দ্বিতীয় প্রযোজনা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘লাল পাঞ্জা’। ওভারটুন

হলে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানে তিনি ছোটো ভূমিকায়— মুৎরুঞ্জি চরিত্রে অভিনয় করেন। তৃতীয় প্রযোজনা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়েরই ‘বন্ধু’ নাটক। সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোডে ওয়াই ডব্লিউ সি-র অভিজাত হলে অভিনয় হয়। এখানে প্রেমকুমারের পার্টে অভিনয় করেন। এরপর ‘চিরকুমার সভা’ নাটকে রসিকের পার্ট করেন। এই পর্বে ‘এনাকা’র মাধ্যমে এভাবেই থিয়েটারের সঙ্গে বাদলের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন ভাবে এগিয়ে গেছে। নিজের হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বাদল তাই বলেছেন—

> ‘‘... আমার ক্ষেত্রে জমি অল্প অল্প করে, টুকরো টুকরো করে হলেও তৈরি হয়েছিল, খানিকটা টাউন প্ল্যানিং, খানিকটা থিয়েটার। লেখার তাগিদটা উপলব্ধি করেছি, অভিনয় করার জন্য করেছি— করতে করতে খানিকটা জিনিস তো হয়। খানিকটা আয়ত্ব হয়।”[২০]

বাদল সরকারের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁর কর্মজীবনের মাইথন পর্বটি। ১৯৫৩ তে যাদপবপুর পলিটেকনিক কলেজের চাকরি ছেড়ে চলে গেলেন মাইথনে। সেখানে ডিভিসি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি মাইথনে থিয়েটারের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। বাদল সরকার কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে অবসর যাপনের জন্য একটা ‘রিহার্সাল ক্লাব’ তৈরি করে থিয়েটার চর্চার ধারা অব্যাহত রাখেন। নাটকের শুধু রিহার্সাল হবে, এই জন্যই রাখা হয়েছিল ‘রিহার্সাল ক্লাব’। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁরা মঞ্চাভিনয়-এ নেমে পড়েন। এখানেও বাদলের সেই প্রিয় ‘ডিটেকটিভ’ নাটক দিয়ে অভিনয় শুরু হয়। তারপর ‘বন্ধু’, ‘অতিথি’, ‘মানময়ী গার্লস স্কুল’, ‘বিরিঞ্চিবাবা’ প্রভৃতি প্রযোজনা খুব সাফল্যের সঙ্গে হয়। এখানে ‘এনাকা’র মতোই চাঁদা তুলে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রায় তিন বছর মাইথনে কাটিয়েছেন। এই তিন বছর থিয়েটার চর্চায় সক্রিয়ভাবেই তিনি যুক্ত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকারের বক্তব্য—

> ‘‘ঠিক ওইখানেই আমার বলতে পারেন থিয়েটার করার ব্যাপার, যাকে থিয়েটার প্র্যাক্‌টিশ বলে, সেইটাতে প্রথম ইন্‌ভলভ্‌মেন্ট শুরু হয়েছিল, ওই মাইথনে।”[২১]

এই পর্বে তাই নাটক রচনা অপেক্ষা, নাট্যাভিনয়ের প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়েছেন বাদল সরকার। নাটক রচনার প্রচেষ্টা এই পর্বে দেখি না। কিন্তু এই পর্ব তাঁকে পরবর্তী পর্বে নাটক রচনার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। সে কারণে মাইথন পর্ব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। পাশাপাশি মঞ্চ প্রযোজনার নানা কৌশলও এ পর্বেই বাদল সরকার প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। এককথায় থিয়েটার নিয়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তার একটা প্রতিফলন এই পর্ব থেকেই দেখা যায়। ভবিষ্যতের একজন নাট্যকার অভিনেতা, মঞ্চপরিচালক এবং সংগঠকের যথার্থ আবির্ভাব ঘটে এই পর্বে।

১৯৫৪ সালের শেষে ফিরে এলেন কলকাতায়। টাউন প্ল্যানিং ডিপ্লোমা থাকায় কলকাতা পৌরসভার সার্ভে বিভাগে— ডেপুটি চিফ ভ্যালুয়ার অ্যাণ্ড সার্ভেয়ারের চাকরিও পেয়ে যান। এবার অভিনয়ের পাশাপাশি নিয়মিত নাটক লেখার মধ্যে নিজের থিয়েটার চর্চার ধারা অব্যাহত রেখেছেন। শিবপুর যাদপপুরের কিছু পাস করা ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কল করে নিয়েছিলেন। এছাড়াও 'এনাকা'র পুরনো কয়েকজন নাট্যোৎসাহী বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে 'এ্যাড-হক বেসিস-এ থিয়েটার'[২২] করেছেন। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার জানিয়েছেন—

> ''— বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কাস্টিং করে একদিন রিহার্সাল হল বন্ধুবান্ধবদেরই বাড়িতে। রিহার্সালটা দিয়ে যখন অভিনয়টা হবে তখন বন্ধুবান্ধবদের কাছে চাঁদা তুলে একটা হল ভাড়া নিয়ে, কার্ড সিস্টেম-এ, একটাই শো। তাড়াতাড়ি করে গ্রুপের একটা নাম দেওয়া হল। ... তা অভিনয়টা হল, গ্রুপটাও ফুরিয়ে গেল। তার দু-বছর পরে আর একটা নাটক যখন হল আবার একটা নাম দেওয়া হল, থিয়েটার হল, সেটা ফুরিয়ে গেল।''[২৩]

অর্থাৎ সেই অর্থে কোনো গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে বাদল যুক্ত না থেকেও এই পর্বে তাঁর থিয়েটার চর্চা করে গেছেন। ইঞ্জিনিয়ার সার্কল-এর ব্যানারে করেছেন রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ' নাটক। করেছেন শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা'। এই 'দেনা-পাওনা' শরৎচন্দ্রের করা 'ষোড়শী' নাটক নয়, বাদল নিজেই তার নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করেছেন। তাই নাটকের নাম 'দেনা-পাওনা'। এরপর করেছেন রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা'। এখানে তিনি তিনকড়ির ভূমিকায় অভিনয় করেন। নাটক লেখা, অভিনয় করা এবং পরিচালনা করা সবটাই—এই সময় তিনি করেছেন। অর্থাৎ একজন নিয়মিত নাট্যকার হিসেবে তাঁকে আমরা এই সময়ে পাচ্ছি। যদিও এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য একটু অন্যরকম:

> ''... নাটক খুঁজছি বলে নাট্যকার হওয়ার চেষ্টাটা চলছে। নাট্যকার হওয়ার চেষ্টা— এই টার্মটাই অবশ্য ভুল, নাটক দরকার, সেই কারণে নাটক লিখবার চেষ্টা করছি, প্রোডিউস করবার চেষ্টা করছি। নাট্যকার হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না।''[২৪]

নাটক দরকার তাই নাটক লিখছেন। অবশ্য সেই অর্থে কোনো মৌলিক নাটক না লিখে উপন্যাস গল্পকে নাট্যরূপ দিয়েছেন। আবার বিদেশী ছবি 'মাঙ্কি বিজনেস' দেখে লিখলেন 'সলিউশন এক্স' নাটক। আগের লেখা নাটকগুলো বাদ দিলে বলা যায় এটাই বাদল সরকারের লেখা প্রথম নাটক। তিনি জানিয়েছেন সেকথা—

> ''... বলা চলে এইটাই আমার প্রথম নাটক। সিণ্ডারেলা, শিবরামের গল্প, বিরিঞ্চিবাবা, আগুন— এগুলোকে ধরছি না।''[২৫]

এইভাবে নাট্যলেখার চর্চা করতে করতে একজন নিয়মিত নাট্যকার হয়ে উঠেছেন বাদল সরকার।

দুই

বাংলা তথা ভারতীয় থিয়েটারের জগতে বাদল সরকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন আরো কয়েক বছর পর। মধ্যকালীন এই সময়ে তিনি দেশে-বিদেশে কখনো ছাত্র, কখনো চাকরিরত। আর সেই সুযোগে পৃথিবীর নানা দেশ-দেশান্তরের অসংখ্য থিয়েটার দেখেছেন— থিয়েটারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছেন। সেই সব থিয়েটার, থিয়েটারের মানুষজনের সংস্পর্শে আসার ফলে বাদল সরকারের মধ্যে তাঁর নিজস্ব থিয়েটারের রূপটি একটু একটু করে গড়ে উঠতে থাকে।

১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত টাউন প্ল্যানিং-এর ছাত্র হিসেবে তিনি লণ্ডনে। এই পর্বটি বাদল সরকারের নাট্য জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লণ্ডনে থাকার সূত্রে সেখানকার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর পরিচয় গড়ে ওঠে। সেখানকার একটি ফিল্ম ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রচুর সিনেমা দেখার সুযোগ হয় তাঁর; যার মধ্যে মার্কিন পরিচালক বাস্টার কিটনের নির্বাক চলচ্চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরই পাশাপাশি লণ্ডনের ঐতিহ্যশালী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় গড়ে উঠে। স্ট্রার্টফোর্ড-অন-অ্যাভনে রয়্যাল শেক্সপিয়ার কোম্পানির ‘রোমিয়ো অ্যাণ্ড জুলিয়েট’, পারিতে ফোলি বার্জেরের নাচ, লণ্ডনের ইস্ট এণ্ড পাড়ায় ব্রেণ্ডান রেহানের ‘দ্য হস্টেজ’ প্রভৃতি থিয়েটার তাঁকে ভীষণ ভাবে উৎসাহিত করছে। এই সময় টাউন প্ল্যানিং-এর পাশাপাশি অসংখ্য থিয়েটার দেখেছেন। তিনি বলেছেন—

> ‘‘এই সময়ে লণ্ডনে বেশ কয়েকটা ভালো থিয়েটার দেখি। বস্তুত এই
> প্রথম আমি সত্যিকার থিয়েটার দেখলাম।’’[২৬]

থিয়েটারের সূত্রেই সেখানকার রঙ্গমঞ্চের মহান ব্যক্তিত্বদের মুখোমুখি দেখবার অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর। যেমন ভিভিয়ান লী (Vivian Leigh), চার্লস লটন (Charles Laughton), মাইকেল রডরেথ, মার্গারটে রলিনস প্রমুখের অভিনয় তাঁকে মুগ্ধ করে। এর মধ্যে সেখানকার এরিনা মঞ্চে ‘থিয়েটার ইন দ্য রাউণ্ড’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ‘থিয়েটার ইন দ্য রাউণ্ড’-আমাদের দেশের যাত্রার মতো মাঝখানে চত্বরে হয়, চারিদিকে দর্শকরা বসে। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দর্শকদের অত্যন্ত কাছে। পর্দা নেই, দৃশ্যপট নেই। থিয়েটারের এই আঙ্গিক বাদল সরকারকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাংলা তথা ভারতীয় থিয়েটারের জগতে তিনি যে নতুন থিয়েটার দর্শনের উদ্ভাবন করেছেন তার মূলে এই অভিজ্ঞতার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তিনি নিজেই সেকথা জানিয়েছেন লিখেছেন—

> ‘‘থিয়েটার ইন দ্য রাউণ্ডে অভিনয় সেই প্রথম দেখি, কিন্তু মনে এমন দাগ রেখেছিল,
> যা আমার কলকাতার অভিনয় জীবনে মূল পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করেছিল।’’[২৭]

বস্তুত লণ্ডন বাসকালের থিয়েটার সংক্রান্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে; থিয়েটার নিয়ে তাঁর চিন্তা-চেতনায় নাড়া দিয়েছে। তার প্রমাণ পাই ৫.১১.১৯৬৩-তে মনুকে লেখা একটি চিঠিতে। তিনি লিখেছেন:

> ‘‘আমাদের মঞ্চ বড়ো শিশু রয়ে গেছে। আর একটু বড়ো হবার সময় এসেছে মনে হয়।’’[২৮]

থিয়েটার নিয়ে এই ধরনের চিন্তা-ভাবনাই পরবর্তীকালে তাঁকে একজন স্বতন্ত্র ধারার থিয়েটারকর্মী রূপে হয়ে ওঠতে সাহায্য করেছে।

এই পর্বে নাটক লেখাও চালিয়ে গেছেন বাদল সরকার। তাঁর ‘বড়ো পিসীমা’ নাটক লণ্ডনে বসেই লেখা। আর যে নাটক বাংলা তথা সর্বভারতীয় থিয়েটার জগতে বাদল সরকারকে প্রতিষ্ঠাএনে দেয়, সেই ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকও লণ্ডনে বাসকালেই লেখা শুরু হয়। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

> ‘‘১৯৫৭ থেকে ’৫৯ আমি লণ্ডনে ছিলাম। ‘প্রবাসের হিজিবিজি’তে ডায়েরির অংশ, কবিতা, চিঠি ইত্যাদি দেওয়া আছে। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর প্রথমাংশটা কিন্তু লেখা হয়ে গেছে ’৫৭-’৫৮ সালেই।’’[২৯]

একদিকে সেখানকার থিয়েটারের নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন অন্যদিকে নিজেকে নাটকের মধ্যে আরো বেশি যুক্ত করে নাটক রচনার প্রতি মনোযোগী হয়েছেন এইপর্বে। চেষ্টা করেছেন কী করে একটি ভালো নাটক রচনা করা যায়, কীভাবে আমাদের বাংলা থিয়েটারকে নতুন করে গড়ে তোলা যায়। নাট্যকর্মী বাদল সরকারের হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে তাই এই লণ্ডন পর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৫৯-এ নির্ধারিত সময়েই পেয়ে গেলেন টাউন প্ল্যানিং-এ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা। এরপর ফিরে এলেন কলকাতায়। লণ্ডন যাবার আগে ‘এঞ্জিনিয়ার্স’ সার্কেল’ নামে যে সংস্থাটি বাদল চালু করে গিয়েছিলেন তার সদস্যবৃন্দ এবং আরো কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের উদ্যোগে আবার প্রবর্তন করলেন ‘চক্র’ নামে একটি সংস্থা। ‘চক্র’ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬০ সালে। ১৯৬৩ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে বাদল সরকার ‘চক্র’-র মাধ্যমেই থিয়েটার চর্চা করে গেছেন। এতদিনের বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার পর চক্র’কে কেন্দ্র করেই তিনি ধারাবাহিক নাটক লেখার দিকে ঝুঁকেছেন। পাশাপাশি চক্রকে কেন্দ্র করে এই সময় থেকে মঞ্চের একজন নিয়মিতা অভিনেতাও হয়ে উঠেছেন। চক্রে’র প্রথম প্রচেষ্টা লণ্ডনে লেখা তাঁর ‘বড়ো পিসীমা’ নাটক, ১৯৬০, ১১ই সেপ্টেম্বর। প্রথমদিকে অনেকটা ‘এনাকা’র পদ্ধতিতে চাঁদা তুলে আমন্ত্রণ পত্র বিতরণ করা হত। ‘বড়ো পিসীমা’র প্রচুর সাফল্যের ফলে উত্তেজনায় তাঁর পরবর্তী নাটক ‘শনিবার’ মঞ্চস্থ হয়। অতঃপর ‘রাম শ্যাম যদু’, ‘কবি কাহিনী’,

‘সলিউশন এক্স’ এবং সবশেষে ‘সমাবৃত’ নামের এক রহস্য নাটক মঞ্চস্থ হয়। এখানে তাঁর নিজের নাটক ছাড়াও অন্যদের নাটক অভিনীত হয়েছে। জে.বি. প্রিস্টলের ‘অ্যান ইনস্পেকটর কলস’-এর বঙ্গীকরণ ‘থানা থেকে আসছি’ অভিনীত হয়। আর লণ্ডনে বসে লেখা অসমাপ্ত ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের রচনা সমাপ্ত করে তা এই চক্রে’র বৈঠকে বন্ধু-বান্ধবদের পড়ে শুনিয়েছেন। চক্র’কে কেন্দ্র করে তাঁর নিয়মিত নাট্যচর্চার সুবাদেই বাংলা থিয়েটারের জগতে বাদল সরকার ধীরে ধীরে একটা প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেন।

১৯৬৩ খ্রি: পর্যন্ত চক্রে’র সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার পর ঐ বছরেই ফরাসি সরকারের টাউন প্ল্যানিং বিষয়ক একটি বৃত্তি পেয়ে ন-মাসের জন্য তিনি ফ্রান্সে যান। প্রথম তিন মাস সুইজারল্যাণ্ড। পরের ছ-মাস প্যারিস। ফ্রান্সে বাসকালে থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতা সেরকম হয়নি। এর একটা কারণ ফরাসি ভাষা বাদল সরকারের ততটা আয়ত্ত ছিল না। তবে মলিয়রের নাটক দেখেছেন। আর অবসর সময়ে লিখে ফেললেন পরপর চারটি নাটক, ‘সারারাত্তির’, ‘বল্লভপুরের রূপকথা’, ‘বিচিত্রানুষ্ঠান’ এবং ‘কবি কাহিনী’। থিয়েটার দেখার সুযোগ না থাকলেও এই সময় তিনি নাটক নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা চিন্তা করে গেছেন, কীভাবে থিয়েটার করবেন তার পরিকল্পনা করে গেছেন। ২৮.১১.১৯৬৩ তে লেখা একটি চিঠিতে তিনি মনুকে লিখেছেন—

> ‘‘থিয়েটার করার কথা, থিয়েটারের প্রোজেক্টের কথা মাঝে মাঝে সাংঘাতিকভাবে মাথায় চেপে বসে। সেদিন আর অন্য কিছু ভাবতে পারি না। সমস্ত বুদ্ধি সমস্ত লজিকের বিরুদ্ধে থিয়েটারের অসম্ভব সব পরিকল্পনা নিয়ে সন্ধে কেটে যায়। হিসেব করি। সেটের ছবি আঁকি। প্রোডাকশনের রূপ দিই মনে মনে। আলোর কথা ভাবি। স্টেজের কথা ভাবি।’’[৩০]

অন্যত্র বলেছেন—

> ‘‘ফ্রান্সে থাকাকালীন আমি বুঝতে পারলাম যে, থিয়েটার আমার ব্যক্তিত্বের এক অপরিহার্য অংশ।’’[৩১]

এভাবেই ধীরে ধীরে থিয়েটার তাঁর ব্যক্তিত্বের এক অপহির্য অংশ হয়ে ওঠে।

ফ্রান্সের ন-মাস কাটিয়ে কিছু দিনের জন্য কলকাতায় ফিরে এসে, ১৯৬৪ সালের ১২-ই জুলাই আবার চলে যান নাইজিরিয়ায়। এখানে প্রায় তিন বছর চাকরিসূত্রে থেকেছেন। লণ্ডনের পর বাদল সরকারের এটাই দীর্ঘ প্রবাসজীবন। এখানেও কাজের অবসরে থিয়েটার নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। নাট্যমঞ্চের সেট তৈরি করেছেন নানাভাবে। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-নাটকের সেটের মডেল তৈরির পরিকল্পনা করেছেন। ১০.১০.১৯৬৪-তারিখে লেখা মনুকে একটি চিঠিতে

সেই পরিকল্পনার কথা জানিয়ে লিখেছেন—

> ‘‘...একটা পুরো ববিবার বসে ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর একটা সেটের মডেল করে সবটা work করিয়ে দেখলাম। চেষ্টা ছিল কতো ছোট্ট স্টেজে হয়। ... বোঝা যাচ্ছে, থিয়েটারের ভূতটা ঘাড় থেকে নামে নি।’’[৩২]

অর্থাৎ থিয়েটার চর্চা তাঁর কোনো সময়েই থেমে থাকে নি। এই সময় বাদল সরকার আরো বেশি করে নাটক করার কথা ভেবেছেন। আর সেইমতো নাটক লেখার দিকে মনোযোগী হয়েছেন। এখানে বসে লিখেছেন ‘যদি আর একবার’, ত্রিংশ শতাব্দী’, ‘পাগলা ঘোড়া’, সমরেশ বসুর ‘বিবর’ উপন্যাসের নাট্যরূপ, ‘প্রলাপ’, ‘বাকি ইতিহাস’, ‘সমাবৃত’ ইত্যাদি। আর ছুটিতে কলকাতায় এসে লিখেছেন ‘বাঘ’ নামের একটি একাঙ্ক নাটক। নাইজিরিয়াতে বসেই নিজস্ব নাট্যদল গড়বার কথা ভেবেছেন। এরই মাঝে ১৯৬৫ সালের ‘বহুরূপী’ পত্রিকার ২২ নম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হল তাঁর বহুচর্চিত ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটক। আর এই নাটকের সূত্র ধরেই সর্বভারতীয় থিয়েটারে বাদল সরকার বিপুল পরিচিতি পেয়ে গেলেন। শম্ভু মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে বাংলা থিয়েটারের একজন নতুন নাটককার হিসেবে বাদল সরকার প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলেন।

তিন বছর একটানা কাটিয়ে নাইজিরিয়া থেকে আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। কলকাতায় ফিরে এসে আপাতত নিজস্ব দল গঠনের চিন্তা থেকে সরে এসে কোনো একটা ভালো নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত থেকে নাট্যকর্ম চালিয়ে যাওয়াই স্থির করলেন। যুক্ত হয়ে পড়লেন শম্ভুমিত্রের ‘বহুরূপী’র সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকারের ভাবনা ছিল—

> ‘‘শম্ভুবাবুর কাছে অভিনয় আর নির্দেশনার অনেক কিছু শেখবার আছে আমার। আর বহুরূপীকে আমি নাটকের জোগান দিতে পারি তারা যখন পছন্দ করছে। অতএব নিজস্ব নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করার যে স্বপ্ন ফ্রান্সে আর নাইজেরিয়ায় দেখেছি, সেটা বাস্তবায়িত করা আপাতত মুলতুবি রেখে বহুরূপী-তে যোগ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।’’[৩৩]

বহুরূপীর সঙ্গে তাঁর বেশ কয়েকটি নাটকের চুক্তি হল— ‘সারারাত্তির’, ‘রাম শ্যাম যদু’, ‘বাঘ’। অবশ্য অভিনয় হয় শুধু ‘বাকি ইতিহাস’ এবং ‘পাগলা ঘোড়া’র। প্রথম দিকে শম্ভু মিত্র এবং তৃপ্তি মিত্র, দু’জনের সঙ্গেই বাদল সরকারের একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। তাঁদের প্রতি তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি সেই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

> ‘‘শম্ভু মিত্র আমার নাটক করছেন, তৃপ্তি মিত্র অভিনয় করছেন— এ তো ভাগ্যের কথা।’’[৩৪]

বেশ কিছুদিন বহুরূপীতে যুক্ত থেকে বাদল তাঁর নাট্যকর্ম-এর ধারা অব্যাহত রেখেছেন। শম্ভু মিত্রের অনুপস্থিতিতে তাঁর নিজের নাটক 'প্রলাপ'-এর নির্দেশনার কাজেও করেছেন। কিন্তু বাদল যে ধরনের থিয়েটার করতে চান সেই পরিসর বহুরূপীতে তিনি পাননি। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই বহুরূপী ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন 'বহুরূপী' তাঁর জন্য নয়। বহুরূপীর সঙ্গে খুব অল্পদিনই কাজ করেছেন। কিন্তু সেই অল্পদিনের মধ্যেই তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেটাও তাঁর নাট্যজীবনে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাদল সরকার জানিয়েছেন—

> ''বহুরূপীর ডিসিপ্লিন আমাকে মুগ্ধ করেছে অবশ্যই। কুমার রায়ের মতো নাট্যব্যক্তিত্বও বাইরে যাওয়ার সময় আমার অনুমতি নিয়েছেন, তাঁর তখন পার্ট নেই কিন্তু।''[৩৫]

বহুরূপী থেকে বের হয়ে এতদিন যে নিজস্ব নাট্যদল তৈরির কথা ভেবে এসেছিলেন, সেই নিজস্ব দল তৈরি করলেন— 'শতাব্দী'। প্রথম দিকে আর পাঁচটা নাট্যদলের মতোই গতানুগতিক মঞ্চব্যবস্থা অর্থাৎ প্রসেনিয়াম থিয়েটারেই 'শতাব্দী'র তার প্রযোজনাগুলো করে। 'কবি কাহিনী', 'বাকি ইতিহাস', 'বাঘ', 'বিচিত্রানুষ্ঠান', 'প্রলাপ', 'সারারাত্তির', 'শেষ নেই' ইত্যাদি নাটকগুলি সবই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মঞ্চের জন্যই লেখা এবং 'শতাব্দী' সেইভাবেই অভিনয় করে। শতাব্দীর প্রতিষ্ঠাকাল (১৯৬৭ সাল) থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রসেনিয়াম মঞ্চব্যবস্থার মধ্যেই বাদল সরকার তাঁর নাট্যকর্মের ধারা অব্যাহত রেখেছেন।

ততদিনে বাদল সরকার সর্বভারতীয় বিপুল পরিচিতি পেয়ে গেছেন। ১৯৬৮ সালে পেয়েছেন ভারত সরকারের সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার। ১৯৬৯ সালে পি.এস.সি.-র মাধ্যমে আবার পেলেন শীর্ষ নগর পরিকল্পকের চাকরি। ঐ বছরেই দু'মাসের জন্য সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রকল্পে পূর্ব ইউরোপের তিনটি দেশ রাশিয়া, পোল্যাণ্ড আর চেকোশ্লোভাকিয়া ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছেন। এই দু'মাসেই সেই সব দেশের প্রচুর থিয়েটার দেখেছেন। পরিচিত হয়েছেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বের সঙ্গে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল গ্রোটোস্কির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। এখানকার মূল আকর্ষণ ছিল 'থিয়েটার ল্যাবরেটরি'-যার পরিচালক ছিলেন গ্রোটোস্কি। তাঁর 'Towards a Poor Theatre' গ্রন্থটির সঙ্গে বাদলের আগেই পরিচয় হয়েছিল; এবার সামনাসামনি তাঁর কাজ দেখলেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হল। গ্রোটোস্কির থিয়েটার কর্ম দেখে তিনি ভীষণ আপ্লুত। থিয়েটারের এক ভিন্ন ভাষার সন্ধান পেলেন তিনি। কলকাতায় ফিরে এসে নতুন উদ্যমে শুরু করলেন 'শতাব্দী'। কম খরচে থিয়েটার করার দিকে তিনি জোর দিলেন। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার জানিয়েছেন—

> ''তখন একটা নীতি আমাদের ছিল, যে সেট, প্রপ্স আর কস্টিউম মিলিয়ে একশ টাকার বেশি খরচ করা হবে না, '*বল্লভপুরের রূপকথা*'র টোটাল সেট খরচ পড়েছিল

> ৬৫ টাকা। বলতে পারেন পুওর থিয়েটারের দিকে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা তখনই দেখা দেয়।"[৩৬]

প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মধ্যে কম খরচে 'শতাব্দী'র একটার পর একটা মঞ্চ সফল প্রযোজনা বাদল সরকারকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়। ঠিক এই সময় ১৯৭১-১৯৭৩ সাল পর্যন্ত জওহরলাল নেহেরু ফেলোশিপ নিয়ে আবার গেলেন আমেরিকায়। সেখানে দেখলেন প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বাইরেও থিয়েটার করার অসম্ভব সংকল্প। বিশেষ করে সেখানকার নিউ থিয়েটার আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তি রিচার্ড শেখনারের থিয়েটার দেখে তিনি ভীষণ উৎসাহিত হন। আবার নতুন করে 'শতাব্দী'-শুরু করলেন। গত দু'দশক ধরে রাসিনের যে 'ফি ড্রে' এবং ফ্রান্সের স্থায়ী 'গোলাকৃতি মঞ্চ' তাঁকে তাড়া করছিল এবার তার রূপায়ণ করলেন। প্রসেনিয়াম মঞ্চ ছেড়ে চলে এলেন অঙ্গন মঞ্চে। ১৯৭১-এ 'সাগিনা মাহাতো' নাটক অঙ্গন মঞ্চে পরীক্ষামূলক অভিনয়ের পর ১৯৭২-এর ১২ নভেম্বর 'স্পার্টাকুস' নাটক থেকে পুরোপুরি চলে এলেন অঙ্গন মঞ্চে। এই অঙ্গন মঞ্চের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

> "আমরা ঘরের সাধারণ আলোয়, কোন সাজসজ্জা ও সামগ্রী ছাড়াই নাটক করলাম। দর্শকদের সামনে রেখে নয়, বরং তাদের চারিদিকে তাদের সঙ্গে জায়গা ভাগ করে নাট্যপ্রযোজনা শুরু করলাম।"[৩৭]

এই অঙ্গন মঞ্চে এসে নাট্যরচনা ও পরিচালনার প্রয়োগ পদ্ধতি পালটে গেল। থিয়েটার হয়ে উঠল নমনীয়-যেখানে ইচ্ছে করা যায়, বহনীয়— সেট, ফ্লাডলাইট এসবের কোনো দরকার থাকলো না ফলে তা হয়ে উঠল সুলভ। নির্মিত হল এক নতুন থিয়েটার দর্শন, যা 'তৃতীয় ধারার থিয়েটার' নামে পরিচিত। এইখানে এসেই যেন নাট্যকর্মী বাদল সরকারের বৃত্তটা সম্পূর্ণ হল। থিয়েটার হয়ে উঠল সব মানুষের, সর্বসাধারণের। থিয়েটারকে চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে না রেখে নিয়ে গেলেন গ্রাম-গ্রামান্তরে। ১৯৮৬-তে থার্ড থিয়েটার -এর কয়েকজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করেন 'গ্রাম পরিক্রমা'। এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন—

> "আমাদের মাধ্যমটির প্রাণশক্তির কথা ভেবে আমরা আর নিজেদের বন্দি রাখলাম না। কখনও বিনা পয়সায় নাটক করেছি। কখনও বা সামান্য ট্রেন ভাড়ার বিনিময়ে। কখনও বা স্থানীয় কোনও সংস্থা স্বেচ্ছাসেবী মানসিকতা নিয়ে আমাদের সাহায্য করেছে। কখনও বা সামান্য আহারের বিনিময়েও নাটক করে গেছি।"[৩৮]

বাদল সরকারের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ইতিবৃত্তটি এইভাবেই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল, এই অধ্যায়ে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

তথ্যসূত্র:

১. সরকার, বাদল : বাদল সরকার, স্মারক সংখ্যা: পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা-১৬, ২, সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ.-১।

২. সরকার, বাদল : নাট্য বিষয়ক সংখ্যা, ‘নির্মাতার মুখোমুখি’ নাম দিয়ে অনুষ্টুপ পত্রিকার পক্ষ থেকে কিছু প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। সে প্রশ্নগুলি না তুলে ধারাবাহিক কথাগুলি সাজিয়ে দিয়েছে এই পত্রিকা।’ সেটিই এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে। অনুষ্টুপ চতুস্ত্রিংশ বর্ষ, ২য় ও ৩য়যুগ্ম সংখ্যা ২০০০, পৃ. ২১৯।

৩. সরকার, বাদল-এর সাক্ষাৎকার : দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, বর্ষ ৬০ সংখ্যা ৩, পৃ. ৩৭

৪. সরকার, বাদল : বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১২

৫. সরকার, বাদল-এর সাক্ষাৎকার : দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, বর্ষ ৬০ সংখ্যা ৩, পৃ. ৩৭

৬. সরকার বাদল : পুরোনো কাসুন্দি (১ম), লেখনী, মে ২০০৬, পৃ. ২৯

৭. তদেব : পৃ. ৩৯

৮. তদেব : পৃ. ৩৯

৯. তদেব : পৃ. ৩৯

১০. তদেব : পৃ. ৪৭

১১. তদেব : পৃ. ৭৯

১২. তদেব : পৃ. ৮০

১৩. তদেব : পৃ. ৫১

১৪. তদেব : পৃ. ৫২

১৫. তদেব : পৃ. ৭৩

১৬. তদেব : পৃ. ৭৪

১৭. সরকার বাদল-এর সাক্ষাৎকার: বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, পৃ. ১০৪

১৮. সরকার বাদল : পুরোনো কাসুন্দি (১ম) , লেখনী, মে ২০০৬, পৃ. ১৪৭

১৯. সরকার বাদল-এর সাক্ষাৎকার: নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ১৯৯৯, পৃ. ২৪৬ এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন বিভাস চক্রবর্তী, সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয়— ১.৯.৯১-এ। পরে স্যাস্-এর পক্ষ থেকে সেটি প্রায় অবিকৃত রেখে ১৯৯৯-এর সংকলন ১৬ তে প্রকাশিত হয়। এটি এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে।

২০. তদেব : পৃ. ২৫২

২১. সরকার, বাদল-এর সাক্ষাৎকার : দেশ, ৫ ডিসেম্বর ১৯৯২, বর্ষ ৬০, সংখ্যা ৩, পৃ. ৩৭।

২২. সরকার বাদল-এর সাক্ষাৎকার: নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ১৯৯৯, পৃ. ২৪৭

২৩. সরকার বাদল-এর সাক্ষাৎকার: নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ১৯৯৯, পৃ. ২৪৭ এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন বিভাস চক্রবর্তী, সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয়— ১.৯.৯১-এ। পরে স্যাস্-এর পক্ষ থেকে সেটি প্রায় অবিকৃত রেখে ১৯৯৯-এর সংকলন ১৬ তে প্রকাশিত হয়।

২৪. তদেব : পৃ. ২৪৯

২৫. সরকার বাদল : পুরোনো কাসুন্দি (১ম), লেখনী, মে ২০০৬, পৃ. ১৮৫

২৬. আচার্য অনিল (সম্পাদক) : নাট্য বিষয়ক সংখ্যা, ‘নির্মাতার মুখোমুখি’ নাম দিয়ে অনুষ্টুপ পত্রিকার পক্ষ থেকে কিছু প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। সে প্রশ্নগুলি না তুলে ধারাবাহিক কথাগুলি সাজিয়ে দিয়েছে এই পত্রিকা।’ সেটিই এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে। অনুষ্টুপ চতুস্ত্রিংশ বর্ষ, ২য় ও ৩য় যুগ্ম সংখ্যা ২০০০, পৃ. ২২০

২৭. সরকার বাদল : পুরোনো কাসুন্দি, দ্বিতীয় খণ্ড, লেখনী, মে ২০০৬, পৃ. ১৯

২৮. সরকার বাদল : প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ২০৫

২৯. সরকার বাদল-এর সাক্ষাৎকার: বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, পৃ. ১০৭

৩০. সরকার বাদল : প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ২১৫

৩১. সরকার, বাদল : বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, অমৃতলোক, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ২৩। 'দি স্টেটসম্যান'-এ প্রকাশিত অশোক নাগকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার, ঐ কথা বলেছেন। অনুবাদক: দিব্যাংশু মিশ্র।

৩২. সরকার বাদল : প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ২৫৮-৫৯

৩৩. সরকার বাদল : স্মারক সংখ্যা : পশ্চিমবঙ্গনাট্য অকাদেমি (১৬) ২সেপ্টেম্ব ২০১৪, পৃ. ১২-১৩। এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন: শ্যামল ঘোষ। সেটিই এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে।

৩৪. সরকার বাদল-এর সাক্ষাৎকার: বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, পৃ. ১০৮

৩৫. তদেব : পৃ. ১০৯

৩৬. সরকার বাদল-এর সাক্ষাৎকার: নাট্যপত্র স্যাস, সংকলন ১৬, ১৯৯৯, পৃ. ২৫৪

৩৭. সরকার বাদল : বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, অমৃতলোক, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ২৪

৩৮. তদেব : পৃ. ২৫